Paper Title - Some Modern Indian Thinkers

Session - 2022-23

Semester - VI

① গান্ধীজির দর্শনে বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর?

⇒ অহিংস সমাজ গঠনের জন্য গান্ধীজী তিনটি নীতিকে ~~গান্ধীজী~~ ব্যক্তি জীবনে এবং সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন, নীতি গুলি হল — বর্ণ ব্যবস্থা, ট্রাস্টীশিপ বা অছিতত্ত্ব, বিকেন্দ্রীকরণ।

① বর্ণ ব্যবস্থা :— প্রাচীন ভারতে বর্ণ ব্যবস্থা পরবর্তীকালে জাতী ভেদ ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র, জাতীভেদ ব্যবস্থা বর্ণ ব্যবস্থার বিকৃত রূপ, প্রাচীন ভারতে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা মানুষের দৈহিক ও মানসিক বর্ণ ভেদে তাদের চারটি বর্ণভেদে বিভক্ত করেছেন, — (i) ব্রাহ্মণ, (ii) ক্ষত্রিয়, (iii) বৈশ্য, ও (iv) শূদ্র, এই বিভাগ জন্ম অনুসারে হয় না, সামর্থ্য অনুসারে হয়, যিনি প্রজ্ঞায় প্রবীণ তিনি ব্রাহ্মণ, তার কাজ হবে শাস্ত্র রচনা পাঠ এবং অধ্যাপনা করা, যিনি বীর্যে প্রবীণ তিনি ক্ষত্রিয়, তার কাজ হবে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং রাজ্য শাসন করা, বৈশ্য সমাজের বাকি মানুষের কাজ হবে ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষি কর্মের দ্বারা সমাজকে সেবা করা।

প্রাচীন ভারতে বর্ণ ব্যবস্থা সমাজ কল্যাণ-মূলক নীতিটি পরিপূর্ণ হয়, এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষকে সমাজের সেবক রূপে গণ্য করা হয়েছে, দাস রূপে নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের মানুষের মত নিম্ন বর্ণের কামার, কুমোর, চর্মকার প্রভৃতিও যে সমাজকল্যাণে মূলত ক্ষেত্রে সমান মূল্যবান প্রাচীন ভারতে বর্ণ ব্যবস্থায় এই সত্য প্রকাশ পেয়েছে।

প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থাকে অনুসরণীয় গান্ধীজী তার সর্বোদয় সমাজের বলেছেন। অহিংস সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে গান্ধীজী প্রস্তাবিত বর্ণ ব্যবস্থার মূল কথা হল — (ক) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বর্ণ

নির্ধারিত ~~জাতি~~ বৃত্তির জন্য সমান পারিশ্রমিক ও মর্যাদা নির্ধারণ করা, (খ) শিক্ষা ক্ষেত্রে কৌলিক সংস্কৃতি প্রয়োগ এবং (গ) কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার না থাকায় বেকার মুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা করা।

(ক) সমাজের বিভিন্ন প্রকার বর্ণ নির্ধারিত বৃত্তির জন্য সমান পারিশ্রমিক ও মর্যাদা নির্ধারণ করা :—

সমাজ সেবার জন্য বিভিন্ন বৃত্তি যেমন — মেথরের, মুচির, কৃষকের, মজুরের, নাপিতের, উকিলের, ডাক্তারের, শিক্ষকের বৃত্তি সমান প্রয়োজন। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য প্রত্যেক সমান মূল্যবান, কিন্তু সাধারণত মেথর, মুচির বৃত্তিকে সমাজ হেয় জ্ঞান করে, এবং উকিল বা ডাক্তারের বৃত্তিকে সমাজ উচ্চ আসন প্রদান করে এবং সেই অনুসারে তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়, এই প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য মেথর মুচি প্রভৃতি সমাজ সেবীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়, সমাজের এই ব্যবস্থা সাম্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সমাজের সেবা মূলক সব কাজের পারিশ্রমিক ও মর্যাদা যদি ~~সমান হয়~~ অর্থাৎ তেমন অসমান না হয়, তাহলে সেবা মূলক বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষের মনে কোনো অসন্তোষ ও থাকে না এবং তারা নিজ কৌলিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে অপরের বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে না, এতে সমাজে শৃঙ্খলা, নিয়মতান্ত্রিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে,

(খ) শিক্ষা ক্ষেত্রে কৌলিক সংস্কৃতির প্রয়োগ :—

গান্ধীজী তাঁর বর্ণ ব্যবস্থায় শিক্ষার ক্ষেত্রে কৌলিক সংস্কৃতি প্রয়োগ করতে বলেছেন, কেননা তাতেই ব্যক্তি তথা সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়. গ্রাম প্রধান ভারতবর্ষে গান্ধীজী

গ্রামবাসীদের বংশানুক্রমিক বৃত্তি শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন এবং কৌলিক বৃত্তি নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছেন কারণ তাতে ব্যক্তি ~~জীবনে~~ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ জীবনে স্থিরতা ~~[illegible]~~ প্রতিষ্ঠা পায়, যদি বিভিন্ন কাজের পারিশ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য না থাকে এবং সব কাজের মর্যাদা সমান হয়, তাহলে বংশানুক্রমিক ~~[illegible]~~ বৃত্তি নির্বাচনই ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে সর্বোত্তম, পরিবারের প্রভাবের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায় যে কুমোরের পুত্রে মৃৎ শিল্প অর্জনের ক্ষমতা একজন কামারের পুত্রের অপেক্ষা বেশি হয়, তেমনি একজন শিক্ষকের পুত্রের শিক্ষণ ক্ষমতা অজ্ঞদের অপেক্ষা বেশি হয়।

সেই কারণে গান্ধীজী বলেছেন 'সমাজে আমার অবস্থান অনুসারে ব্যক্তির কর্ম নির্ধারিত হবে' এই নীতিকে অনুসরণ করেই গান্ধীজী মানুষকে কৌলিক বৃত্তি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজী কৌলিক বৃত্তি গ্রহণকে সমাজে একেবারে বাধ্যতামূলক বলেও তাকে আবশ্যিক বলেননি। অর্থাৎ যদি এমন হয় যে কোনো ব্যক্তির কৌলিক বৃত্তি প্রতি রুচি নেই এবং সেই কাজে তার কোনো দক্ষতা নেই তাহলে সেই ব্যক্তিকে কৌলিক বৃত্তি গ্রহণের পরিবর্তে অন্য কোনো বৃত্তিকে বাঞ্ছিত রূপে গ্রহণ করা উচিত।

(গ) কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা না থাকায় বেকার মু[ক্ত] সমাজের প্রতিষ্ঠা করা :—

কর্মক্ষেত্রে কৌলিক বৃত্তি গ্রহণ করার ফলে প্রত্যেকে তার নিজস্ব বৃত্তিতে গ্রহণ জীবিকা অর্জন করতে পারে। এমন কী কর্মের জন্য অযৌক্তিক প্রতিযোগিতা থাকে না এবং সমাজ হয় বেকার মুক্ত, বিশৃঙ্খলাহীন সমাজ প্র

ব্যবহারিক বেদান্ত :

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায়, ভারতীয় দার্শনিকগণ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, উপরন্তু তাদের দার্শনিকতালব্ধ জ্ঞানরাশিকে তার ব্যবহারিক জীবনেও প্রয়োগের কথা বলেছেন, অর্থাৎ চর্চা ও চর্যার আশ্চর্য মেলবন্ধন ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় দার্শনিকদের উত্তরসূরী হয়ে সেই কাজটি এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তিনি তার বক্তৃতায় বারংবার বলেছেন যদিও আদর্শ তত্ত্ব, সেই তত্ত্বের কার্যকরী অবস্থার তুলনায় উচ্চমানের, তথাপি একটি আদর্শ তত্ত্ব যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবহারিক জীবনের সাথে যুক্ত হতে পারছে, ততক্ষণ তার সার্থকতা নেই, বেদান্ত দর্শনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়, বেদান্ত দর্শন যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাবদর্শন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু বেদান্তের সূত্রগুলি যদি বাস্তবজীবনের থেকে ভিন্নতর হয়, তাহলে তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে বলে তিনি মনে করেন।

ব্যবহারিক বেদান্তের অর্থ:

বেদান্তের মূল সূত্রকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কথা বিবেকানন্দ জোরের সঙ্গেই বলেছেন, মানুষের জীবনের প্রতিটি চিন্তায়, আচরণে, কর্মে বেদান্তের মূল ভাবনার প্রতিফলনই হল বেদান্তের সারকথা, তিনি ইংল্যান্ডের একটি বক্তৃতায় বলেছেন – "বেদান্ত যদি একটি আদর্শ ধর্ম হয় তাহলে তাকে অবশ্যই ব্যবহারিক হতে হবে, বেদান্তকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। বেদান্তের তত্ত্ব বা ধর্মের সঙ্গে জাগতিক জীবনের সমস্ত পার্থক্যকে মুছে ফেলতে হবে। বেদান্ত যে একত্বের কথা বলে, যে এক প্রাণের সর্বত্র বিরাজমানতার কথা বলে, তাকেই সমস্ত চিন্তাভাবনায় এবং কাজে গ্রহণ করতে হবে।

ব্যবহারিক বেদান্তের উদ্দেশ্য:

বেদান্তের আদর্শ অনুযায়ী সর্বভূতের অদ্বয় ব্রহ্ম বিরাজমান, যদি সর্বভূতেই ব্রহ্ম উপস্থিতি থাকে তাহলে কেউই পর হতে পারেনা, কেউই ছোট জাত হিসেবে তুচ্ছ হতে পারেনা, সকল জীবের মধ্যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অনিবার্য উপস্থিতি জ্ঞান আর সকলের প্রতি সেবামূলক আচরণ করাই বেদান্তের অন্যতম আদর্শ।

বেদান্তের অন্যতম মূলাদর্শ হিসেবে বিবেকানন্দ ভাগবত গীতার কর্মরহস্যের উল্লেখ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে – তীব্র কর্মশীলতা, কিন্তু তার মধ্যে চিরশান্তভাব। – এটিই কর্মরহস্যের মূল কথা, বিবেকানন্দের মতে এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য, তিনি বলেছেন,

"বেদান্তের আদর্শ যে প্রকৃত কর্ম তা অনন্ত স্থিরতার সহিত জড়িত, যাহাই ঘটুক না কেন সেই স্থিরতা কখনও নষ্ট হইবার নয়।

ব্যবহারিক বেদান্তের উল্লেখযোগ্য দিক:

স্বামীজী বলেন বেদান্ত যে আদর্শের কথা বলে তা 'বাস্তব' বা 'কার্যকর' অপেক্ষা অনেক উচ্চে, ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে, সকল জীবেই ঈশ্বর দর্শন করে, জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের সেবাকর্মে জীবন উৎসর্গ করাই বেদান্তের শিক্ষার উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি বলেন বেদান্তই একমাত্র ধর্ম যা সার্বজনীন প্রেমের আদর্শে জীবন গঠন করার কথা বলে। এই ধর্মই মানুষকে শেখায় তত্ত্বমসি — তুমিই সেই ব্রহ্ম। মানবই ব্রহ্ম আর সকল মানুষের মাঝে ঈশ্বর দর্শনই আমাদের একমাত্র ধর্মাচরণ, মানুষ এই সত্য উপলব্ধি ও জ্ঞান নিয়েই জন্ম নিয়েছে, স্বামীজী বলেন — "Vedanta shows that it is realized already, it is already there." নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে আমাদের,

ব্যবহারিক বেদান্তের মূল নীতি:

বিবেকানন্দের অভিনবত্ব এখানে যে, তিনি বেদান্তের উচ্চজ্ঞানরাজির সাথে একদিকে প্রেম ও করুণার মতো নৈতিক প্রত্যয় কে যুক্ত করেছেন এবং এর সাথেই কর্মপ্রেরণার বিষয়টিকে সংযোজন করেছেন। তার ভাবনায় বেদান্তের দর্শন শঙ্করাচার্যের মতো অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন দার্শনিকের হাতে উচ্চস্তরের জ্ঞানজ্যোতিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এই উচ্চজ্ঞানরাজির সাথে চাই প্রশস্ত হৃদয়বত্তা, প্রেম ও করুণার নিত্য সংযোগ যা আমরা গৌতম বুদ্ধের জীবনদর্শন থেকে পাই। তাই ব্যবহারিক বেদান্তের ভিত্তি হল উচ্চচিন্তা সমন্বিত মস্তিষ্ক (Head), প্রশস্ত হৃদয় (Heart) এবং এগুলির সহযোগে মানবকল্যাণ করার মতো উপযুক্ত হস্ত (Hand)। এই 'Head-Heart-Hand' বা 'Triple-H' -এর নীতিই বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তের মূল নীতি,

বেদান্তের সার্বজনীন আবেদন ও বিশ্বমানবতাবাদ:

বেদান্তের স্বার্থহীন পরার্থপরতার আদর্শ যে নিজ আত্মোন্নতিরই সহায়ক, এ বার্তা আজ জনে জনে প্রচারের প্রয়োজন। মন্দির, মসজিদ, গির্জার উপাসনায় আবদ্ধ না থেকে জীবন্ত দেবতার উপাসনা দ্বারা মানবজীবনের ক্রমহ্রাসমান মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটানোর প্রয়োজন। স্বামীজী বলতেন, "Life is itself religion." দৈনন্দিন জীবনের সব কর্মই ধর্ম পালনের অন্য নাম, স্বামীজী বলেন, নিষ্কাম কর্মযোগ

মানবকে ক্রমশ ধাপে ধাপে তার কাম্য পরিনাম অভিমুখে
এগিয়ে নিয়ে চলেছে, আর এই কাম্য পরিনাম হল মুক্তি, স্বাধীনতা
— যা নবজাগরনেরই মূলমন্ত্র। মানব কল্যাণ, দরিদ্রনারায়নের সেবা,
দেশের প্রতি প্রেম — স্বামীজীর বানীর ছত্রে ছত্রে অনুরণিত, এই প্রসঙ্গে
তাঁর বিখ্যাত উক্তি, "Arise awake and stop not till the goal
is reached."

গান্ধীজীর 'অছি' ভাবনা :—

অছি ব্যবস্থা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শনের অন্যতম চর্চিত বিষয়, তার অছি ব্যবস্থা সম্পর্কে মতবাদ যেমন অর্থনৈতিক চর্চার দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের এক কেন্দ্রীয় ভাবনা, সত্য, অহিংসা, করুণা প্রভৃতি মূল্যবান প্রত্যয়গুলির উপর নির্ভর করে গান্ধীজীর অন্যান্য ভাবনাগুলি আবর্তিত হয়েছে, একইসঙ্গে 'অছি' সম্পর্কিত গান্ধী-ভাবনাও এই নৈতিক প্রত্যয়গুলির উপর প্রতিষ্ঠিত।

অছিবাদের তাৎপর্য :

'অছি / Trustee' বলতে বোঝায় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বা রক্ষাকর্তা। অভিধানগত অর্থে অছি বলতে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে বোঝাতে পারে যে অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ অথবা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়ভার গ্রহণ করেছে। দীর্ঘদিনের জন্য যদি কেউ দেশ ছেড়ে বাইরে যায়, তার অর্থ ও সম্পত্তি দেখভালের জন্য অছি নিয়োগ করা যায়। আবার সম্পত্তির মালিক নাবালক হলে আইনানুসারে কোন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে অছিরূপে নির্ধারিত করা যায়, যার উপর সেই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের বা নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ভার আইনিভাবে ন্যস্ত থাকে। তবে অছি কখনই সেই সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেনা। অছি সেই সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারে না, সে তার জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু সম্পত্তি থেকে মিতব্যয়ীর মত গ্রহণ করে। তার জীবনের লক্ষ্য হবে সম্পত্তির প্রকৃত

মালিক দেশে ফিরলে অথবা সাবালক হয়ে উঠলে, তার সবটুকু ধন-সম্পত্তি তার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া, অছি ভাবনা হল সেই আদর্শ, যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি, যে শুধু সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণই করে, কখনোই সম্পত্তির মালিক হিসাবে ভোগদখল করেনা, ত্যাগ ও সত্যের আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অছি-ভাবনাকে গান্ধীজি নিজস্ব দর্শন চিন্তায় স্থান দিয়েছেন।

অছি ভাবনা ও সমাজ পরিবর্তন:

গান্ধীজী মনে করেছেন, তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন-সাধন একমাত্র অছি-ভাবনার মাধ্যমেই হতে পারে। অছি-ভাবনার আদর্শ একথাই বলে, প্রাকৃতিক সম্পদ কোন ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখা অনুচিত। এমনকী রাষ্ট্রীয় মালিকানার বিষয়টিও অছিবাদ অস্বীকার করে।

রাজা, জমিদার, পুঁজিপতি, বিত্তশালী সম্প্রদায়ের মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলেও তারা সে-সম্পত্তির প্রকৃত মালিক নয়, গান্ধীর এই বক্তব্যের পেছনে বেদান্তের ত্যাগের ধারনাটি সম্যকরূপ কার্যকরী হয়েছে। যদি, জমিদার, পুঁজিপতি মানুষরা ত্যাগের আদর্শকে গ্রহণ করে নিজের অতিরিক্ত সম্পদকে অপরাপর সমাজের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তবেই অছি ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হবে।

ভগবত গীতা, যা বেদান্তের অপরিহার্য অংশ, সেখানে "non-possession" বা অপরিগ্রহের ধারনাটি বিবৃত, তাকে গান্ধীজী গ্রহণ করেছেন। তাই সেই অছি-ব্যক্তি কখনোই সমাজের সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে ভোগ করবে না, অপরিগ্রহের সুমহান আদর্শকে পাথেয় করে যাবতীয় সম্পদের কেবল দেখভাল করবেন।

অছিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য:

এপর্যন্ত আলোচনা থেকে আমরা মহাত্মা গান্ধীর অছিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করতে পারি ——

(১) গান্ধীর অছিবাদে ব্যক্তিগত ধারনাকে অস্বীকার করা হয়নি, অস্বীকার করা হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানাকে।

(২) গান্ধীজীর অছিবাদের ধারনার ভিত্তিতে রয়েছে ত্যাগ ও সমত্বভাবের সুমহান ভারতীয় দার্শনিক বোধ।

(৩) গান্ধীজীর অছি-ভাবনার লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত মালিকানা প্রত্যয়টির বিলোপসাধন, ধনসম্পত্তির মালিকানার পরিবর্তে ধন-সম্পত্তির রক্ষণকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা প্রত্যয়ের প্রচলন।

(৪) অছিবাদের অপর একটি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য হল এক্ষেত্রে ধন-সম্পত্তির ব্যবহারকে সকলের আওতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করা হয়।

(৫) অছিবাদে পুঁজিকরনের বিপক্ষতা করা হলেও, সেই প্রতিবাদ অহিংস পথে হতে হবে।

(৬) অছিবাদ কখনই সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ধারনাটিকে স্বীকার করে না। তাঁর মতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারিত হওয়াউচিত সমাজের চূড়ান্ত অনুমোদনের মাধ্যমেই।

(৭) অছিবাদের অন্যতম মন্ত্র হবে, যতটুকু মৌল প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজন তার অতিরিক্ত সম্পদ গ্রহন না করা।

(৮) সকল মানুষের আয়ের অর্থনৈতিক কাঠামো অছি ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(৯) অছি-সদস্যরা প্রত্যেকে পরমেশ্বরের সম্পত্তির রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করবে।

(১০) অছি - সদস্যরা কখনই চিরস্থায়ী নয়। কোন সম্পত্তির অছি যদি সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষনে পারদর্শী না-হয়, যেযদি ব্যক্তিগত মালিকানা হিসেবে সম্পদের ব্যবহার করে, তবে সেই অছিকে পদচ্যুত করা যাবে।

<u>সমালোচনা</u> :-

সর্বোদয় স্বরাজের মতো গান্ধীজীর অছি- ভাবনাও বিস্তর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। তার কয়েকটি আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি।

(1) সমালোচকরা বলেন গান্ধীর অছি- ভাবনা উচ্চ আদর্শ ও সর্বোচ্চ নৈতিক মতবাদ হলে বাস্তবে তার রূপায়ন সম্ভব নয়। মানুষ ব্যক্তি- গত সম্পত্তির মালিকানা ত্যাগ করে তাকে অপরাপর মানুষের সম্পত্তি হিসেবে রক্ষণ করবে - এই ঘটনা কল্পনাতেই হয়।

(2) সমালোচকেরা অছিবাদের বিরূপ সমালোচনা করে বলেছেন, গান্ধীজীর অছিতন্ত্র প্রকারান্তরে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। অছি ব্যবস্থা চাতুরীপূর্ণ উপায়ে পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণের বৈপ্লবিক ভাবনাকে প্রশমিত করতে চায়,

(3) সমালোচকরা আরও মনে করেন, গান্ধীজীর অছিবাদ মানুষের অর্জন করার ক্ষমতাকে মান্যতা দেয় না। গান্ধীজীর অছিবাদের পরিকল্পনায় নিঃস্ব মানুষদের স্বাচ্ছন্দ্য বিত্তশালী মানুষদের শুভবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, বিত্তশালী মানুষরা যদি তাদের আদর্শ গ্রহণ করে নিজেদের অছিরূপে কল্পনা করে তবেই সম্পদহীনরা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে,